Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'রবীন্দ্র-ভাবনা' : সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি ও সাহিত্যচিন্তা

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.8
Pages	73-84
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘রবীন্দ্র-ভাবনা’ : সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি

মোহাম্মদ আজম*

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের কবছর এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ সময়-পরিসরে আহমদ শরীফ বাংলাদেশের বিদ্বৎসমাজে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি ভোগ করেছিলেন নমস্য এক দিক-নির্দেশকের ভূমিকা, আর মৃত্যুর পরও তাঁর কৃতি চিহ্নিত হয়েছে ঈর্ষণীয় মহিমা ও শ্রদ্ধায়।[১] বাঙালির সাহিত্য ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে, তাঁর প্রধান বিচরণক্ষেত্রে, তিনি সৃষ্টিশীল অনন্যতায় বারংবার দীপিত-প্রাণিত-প্রশ্নাকুল করেছিলেন সমকালকে। স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত দৃষ্টিতে বাঙালির প্রধান পুরুষদের পুনঃপাঠ করেছেন তিনি, প্রশ্নালোকে উন্মুক্ত করেছেন তাঁদের অনালোকিত-স্বল্পালোকিত কোনো-কোনো প্রান্তদেশ; আর এভাবে, আকাঙ্ক্ষা জাগাতে চেয়েছেন বৃহৎ ও মহৎ জীবনের প্রতি। স্বভাবতই তিনি বারবার ফিরে তাকিয়েছেন বাঙালির মহত্তম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুলায়তন জীবন ও সৃষ্টিতে।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল অন্তত চারটি রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনা। আর তাঁর শেষ রচনাটিও রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই লেখা।[২] এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাঁর রবীন্দ্র-বিবেচনায় পরিবর্তন ঘটেছে, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারের মানদণ্ডও একরকম থাকে নি। বহুল আলোচিত বিতর্কিত একাধিক প্রবন্ধের উপস্থিতিতে আর নিজস্ব ঘরানার সাহিত্যচিন্তার তাপে-ভাঁপে আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-ভাবনা বিশিষ্টতা পেয়েছে।

২.০

আলোচনার সুবিধার্থে আহমদ শরীফের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনাবলিকে[৩] ভাগ করা যাক তিন ভাগে। এর প্রথম ভাগে পড়বে ‘সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা’, ‘রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে’, ‘অতীন্দ্রিয়লোকে রবীন্দ্রনাথ’ প্রভৃতি প্রবন্ধ, যেখানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবয়বে শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করেছেন তিনি। রচনাগুলো লেখকের *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থভুক্ত।

আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে আহমদ শরীফ রবীন্দ্র-বিবেচনায় প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর বুদ্ধিজীবী সত্তাকে, অনুসন্ধান করেছেন আমাদের মনন ও হৃদয়-দেশে রবীন্দ্রসাহিত্যের স্থিতি ও উপযোগিতা। এর মধ্যে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত সময়-পরিসরের কয়েকটি রচনাকে চিহ্নিত করা যাক দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী দীর্ঘ-সময়ের কয়েকটি বিতর্কপ্রসূ রচনাকে নেয়া যাক তৃতীয় ভাগে।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে রবীন্দ্রসাহিত্য-বর্জন ও সংশ্লিষ্ট নানা অনুষঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ঢাকায় একটি ভিন্ন চেহারায় আবির্ভূত হয়েছিল। আমাদের সংস্কৃতির সেই সংকটকালে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল এদেশের সংস্কৃতিসেবীদের আত্মার চিহ্নায়ক। এসময় প্রগতিশীল ও নিরাসক্ত রবীন্দ্র-বিচার আহমদ শরীফের দ্বিতীয় ভাগের প্রবন্ধগুলোকে মূল্যবান করেছে। এ-পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ'। প্রবন্ধগুলো লেখকের *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা* (১৯৬৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আহমদ শরীফের যে-বিতর্কিত অবস্থান, তার সূচনা হয় 'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' শীর্ষক রচনায়। 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' শিরোনামের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির চরম রূপটি ধরা পড়েছে। এছাড়া আমৃত্যু আরো কয়েকটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর যে-দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, তা একদিকে মতবাদপুষ্ট, অন্যদিকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

২.১

'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ কলকাতাকেন্দ্রী বাঙালি রেনেসাঁসের পূর্বাপর অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইউরোপি বুর্জোয়া বিকাশের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে দেশ ও কালের একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপন করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রমনীষাকে এখানে পুরোপুরি পরিপ্রেক্ষিতের ফল হিসেবে দেখানো হয় নি; বরং জনাব শরীফ লক্ষ করেছেন, সমকালীন চিন্তা ও এর সম্ভাব্য বিকাশধারাকে নানা অর্থে অভাবনীয় বিস্তৃতি দান করে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েছিলেন যাবতীয় সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বাত্মবোধের চেতনায়। প্রাথমিকভাবে এই উত্তরণের চাবি-সূত্রটি ছিল, তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা, যে 'সৌন্দর্যবোধ প্যাগান নয়, গ্রিক নয়, আধ্যাত্মিকও নয়।' আর নয় বলেই তার অনন্যতা অনুভবগোচর হয় নিমেষেই।

অন্য অনেকের মত আহমদ শরীফও এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-চেতনাই রবীন্দ্রচিত্তে বৈচিত্র্যে ঐক্য-তত্ত্বেরও বীজ বুনেছিল" (আহমদ শরীফ, ২০০১ : ১২)। প্রাচীন গ্রিকদের মত, প্রাচীন ভারতীয়দের মত, রবীন্দ্রনাথও এই মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই প্রকৃতি বা নিসর্গের বিচিত্র ও খণ্ডক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে ঐক্যানুভূতি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তিনি অনায়াস সহজতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে ঐক্যের যে-স্বরূপ আকৈশোর প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাকে মানব-জগতের ব্যবহারিক ধারায় উপলব্ধি করার কাজটি অবশ্য সহজ ছিল না। যে-পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি, তাতে ছিল অবিকশিত বুর্জোয়া সংস্কৃতির রুচি ও আদর্শ; আর একই সঙ্গে ছিল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী কর্মকাণ্ডের সক্রিয়তা। দেশ-জাত-ধর্মের খোলসমুক্ত হতে, আহমদ শরীফের মতে, তাঁর লেগেছিল অন্তত পঁয়তাল্লিশ বছর। ধীরে ধীরে সৌন্দর্যবুদ্ধিপ্রসূত বিশ্বচেতনা দিয়েই "বিশ্ব-

প্রকৃতিতে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে যে-ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, মানব জগতেও পেলেন সে-তত্ত্বের সন্ধান" (আহমদ শরীফ, ২০০১ : ১৪)।

'রবীন্দ্র-মানসের স্বরূপ সন্ধানে' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র-মানস ইউরোপের ফসল। পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁস উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বুর্জোয়া বিকাশে পরিণতিপ্রাপ্ত হয়ে মনুষ্যত্ব ও মানব-মহিমার যে-শিখরদেশ স্পর্শ করেছিল, ইংরেজির হাত ধরে তা-ই আকণ্ঠ পান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-সত্য উনিশ শতকের জাগ্রত-বিকশিত ব্যক্তিমাত্রের জন্যই সত্য। তবে আহমদ শরীফ এই বিকশিত ভারতীয় মহাত্মাগণকে ভাগ করতে চান দুভাগে : প্রতীচ্য চিন্তাকে সোজাসুজি সাঙ্গীকৃত করতে চেয়েছিল একটি দল, অন্য দলটি চেয়েছিল গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে সমন্বিত পন্থার উদ্ভাবন; আর খানিকটা বিভ্রান্তিকরভাবেই যেন, রবীন্দ্রনাথকে অংশীভূত করেন প্রথম দলের। এখানে তিনি দেখিয়েছেন, আবাল্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধারণাকে আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে পরম একাগ্রতা এবং উন্মুখতাই রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করে দিয়েছিল ঠাকুর বাড়ির খ্যাতিমান আর দশজন সদস্য কিংবা কলকাতার ঐ-কালের মহাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গ থেকে। তাঁর মতে, ইংরেজবাহিত ইউরোপি ঔদার্য, বিশ্বাত্ম এবং মানবতাবোধের সমর্থন রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন "উপনিষদে, বুদ্ধের বাণীতে, মধ্যযুগের সন্তদের সাধনায় ও বাউলের কণ্ঠ নিঃসৃত গানে" (আহমদ শরীফ, ২০০১:২১)। কিন্তু এর সব কটিই ঐ-কালের ভারতে অথবা কলকাতাকেন্দ্রী বাঙালি জীবনে জ্ঞানগত ও আচরণগত— দুই অর্থেই ছিল অত্যন্ত অবদমিত ধারা। "অতএব, এগুলোকে নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করার প্রেরণা ও দীক্ষা রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন য়ুরোপ থেকেই" (আহমদ শরীফ, ২০০১:২১)।

'অতীন্দ্রিয়লোকে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি উপস্থিত করেছেন কবি-জীবনের শেষ পর্যায়কে, যেখানে কবি "জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভূমি ও ভূমার অনুভূতি সংমিশ্রণে এক অতীন্দ্রিয় লোকের সন্ধান পেয়েছেন" (আহমদ শরীফ, ২০০১:২৬)। তিনি লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ জীবন আরম্ভ করেছিলেন 'বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা' নিয়ে, আর শেষ করেছেন 'প্রত্যয় ও তৃপ্তিতে'। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় "তাঁর চিত্ত-সাধনার দুটো শাখা : সৃষ্টির রহস্য-চেতনা আর মানব-ঐতিহ্য মন্থন।" দুটোই কবির ইতিবাচক জীবন-বীক্ষণের উৎস, সে-ইতিবাচকতা তাঁর কবি-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনাহত ছিল। হয়ত-বা শেষপর্বের কবিতাবলিতে তাই ঘুরে-ফিরে নানা রূপে এসেছে আলোকোজ্জ্বল সূর্যের প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র-কাব্যধারা ও বিশ্বাত্মবোধ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐক্যতত্ত্বের ধারণাটি পুরনো ও বহু-ব্যবহৃত। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁর রাজনীতি, শিক্ষা কিংবা কৃষি-বিষয়ক চিন্তাধারাকে ঐক্যতত্ত্বের আলোকে চেখে দেখার প্রচেষ্টায় 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' প্রবন্ধটি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-মানসে ইংরেজ-বাহিত পাশ্চাত্য-চেতনার প্রবল প্রতাপ চিহ্নিত হয়েছে 'রবীন্দ্র মানসের স্বরূপ সন্ধানে' প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলোতে সম্ভাব্য স্বল্পতম পরিসরে ব্যক্তি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

২.২

পাকিস্তান-আমলের রাষ্ট্রীয় অপতৎপরতা এবং সুবিধাবাদীদের সক্রিয়তার কালে আহমদ শরীফ রবীন্দ্র-বিচারে দারুণ স্বস্থতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে রচিত 'পঁচিশে বৈশাখ' শীর্ষক রচনায় দেখা যায়, তিনি কোনো সুবিধাবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গে' শিরোনামী খর্বকায় রচনাটিও সমকালে রবীন্দ্র-চর্চার প্রেক্ষাপটে লিখিত। ঐ-কালে রবীন্দ্র-চর্চার বিরুদ্ধে যে-রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল, তাতে যেমন সংগত কারণে তাঁর সায় ছিল না, ঠিক তেমনি কোনো কোনো রবীন্দ্রপ্রেমী-যে উদ্যোগী হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে 'আধা-মুসলিম' বানিয়ে রবীন্দ্র-চর্চার ব্যাপারে সরকারের কৃপা-দৃষ্টি লাভ করায়, তাতেও তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। তাঁর বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ যাবতীয় নিজস্বতা সমেতই 'মানবতার প্রমূর্ত প্রতিনিধি'। তাই আমরা নিজেদের প্রয়োজনেই বারবার ফিরে যাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে। এক্ষেত্রে তাঁকে বাতিল করার চেষ্টা কিংবা কাটছাঁট করে গ্রহণ করার প্রস্তাব—দুটোই ঐ-মহান পুরুষের জন্য অপমানকর।

এ-সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ'-এ তিনি উনিশ শতকের কলকাতাকেন্দ্রী বাঙালির বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভুল চিত্র অঙ্কন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপস্থিত করেছেন। এখানে আরেকবার তিনি লক্ষ না-করে পারেন নি যে, শুধু কাল ও প্রতিবেশগত বিবেচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভাকে চিহ্নিত করা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়; কারণ, রবীন্দ্রনাথ সেকালের ঔদার্য, মাহাত্ম্য এবং মহৎ মানুষের লীলাক্ষেত্রের সাপেক্ষেও অসামান্য। তবে বাঙালির নবজাগরণের যেটি মূল সীমাবদ্ধতা— অবিকশিত সমাজ-কাঠামোয় বৃহত্তর জনজীবন বঞ্চিত 'দেখে শেখা ও পড়ে পাওয়া কৃত্রিম ও অনুকৃত জীবন'-বোধ— তার কুফল এড়াতে পারেন নি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। জনাব শরীফের এ-মন্তব্য লক্ষ্যভেদী যে, "রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধও তাই সংবেদনশীলের মহাপ্রাণতাজাত— সমস্যা-বিব্রত দেশকর্মীর নয়" (আহমদ শরীফ, ২০০১:৪০)।

ফলে, তিনি লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য আক্রান্ত হয়েছে অন্তত দুশ্রেণীর মতবাদীর অভিযোগে : "একদলের পক্ষে তা (এই সাহিত্য) পরিত্যাজ্য বুর্জোয়া সাহিত্য বলে, অপর দলের কাছে অশ্রদ্ধেয় হিন্দুয়ানী বলে" (আহমদ শরীফ, ২০০১:৪২)। এদের মধ্যে মার্কসবাদীদের আক্রমণটিই ছিল ব্যাপকতর এবং অধিকতর শাণিত। মার্কসবাদী সাম্যবাদের প্রতি খানিকটা অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেও জনাব শরীফ কিন্তু রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদের ব্যাপারে তাদের অনাস্থায় যৌক্তিকতা খুঁজে পান নি। মার্কসীয় সাম্যবাদ এখানে তাঁর কাছে দীর্ঘ মানবেতিহাসের অসংখ্য সাম্য ও মানবতার চিন্তার একটি বিশেষ রূপ মাত্র। হাজার বছরে নানা রূপে মানবতার যে-বিকাশ আজ ভোগ করছে বিশ্ববাসী, তাঁর ভাষায়, রবীন্দ্রদর্শনও তারই অংশীদার। সে-দর্শন কারো মতবাদের ছাঁচে খাপ খায় না বলে তাদের অনুযোগ থাকতেই পারে; কিন্তু "তাঁর এই জীবনদৃষ্টিকে বুর্জোয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস করা অসৌজন্য" (আহমদ শরীফ, ২০০১:৪৪)।

এ-প্রবন্ধে তিনি মার্কসবাদী উপযোগবাদিতাকে বিশ্লেষণ করেছেন আন্তরিক ভঙ্গিতে, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকভাবে। রবীন্দ্রনাথের অবস্থানটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও, তাই, থাকতে পেরেছেন নিরাসক্ত; যে-নিরাসক্তির অভাব তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহে মাঝে-মধ্যেই প্রকট হয়েছে। অন্য আরেকটি কারণে 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য : "রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উত্তরকালের আহমদ শরীফের ধারণা ও অভিমতের সূচনা করেছে এই প্রবন্ধটি" (রচনাবলি, গ্রন্থ পরিচিতি অংশ, ২০০০:৬৭৬)।

২.৩

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-ভাবনায় ঘটে গেছে আমূল বিবর্তন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই একালে তাঁর বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হয়। মার্কসবাদী মতাদর্শকে এসময় তিনি অবলম্বন করেন উপযোগিতা বিচারের মাপকাঠি হিসেবে, আর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এবং শিল্পিতাকে একাকার করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে শুরু করেন খানিকটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর রবীন্দ্র-বিচারের ক্ষেত্রে কম-বেশি এই প্রবণতাই আমৃত্যু অব্যাহত ছিল।

'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' শীর্ষক রচনায় তাঁর প্রাগুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এ-প্রবন্ধে স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর নতুন মূল্যায়ন এবং সেই মূল্যায়নের স্বপক্ষে যুক্তিমালা উপস্থাপিত হয়েছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে তিনি কালিদাসের মত মহৎ কবি বলেই মানেন, যেমন মানতেন আগেও; কিন্তু, তাঁর ভাষায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে-অঙ্গীকার নিয়ে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ, তাতে 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রেরণার উৎস হতে পারেন না'। এখানে তিনি দলীয় মতবাদকে মান্য করেছেন, উপযোগ-বিচারে শিল্প-সাহিত্যকে রাষ্ট্রিক এবং ব্যক্তিগত— এ-দুভাগে বিভক্ত করে রবীন্দ্রনাথকে 'মনোভূমে' বিচরণের জন্যই যথার্থ ভেবেছেন, রাষ্ট্রভূমে নয়। তাঁর মতে, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য— সম্পদ নন, আমাদের প্রেরণার উৎস সুকান্ত" (আহমদ শরীফ, ২০০১:৫৪)।

'১৩৯০ সালে আমার চেতনায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনায়ও তাঁর বক্তব্য পূর্বানুগ। এখানে নিজেকে একজন মার্কসবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি তাকিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের দিকে, খুঁজে পেয়েছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিম্নশ্রেণীভুক্তদের অনুপস্থিতি, রবীন্দ্রমানসে রক্ষণশীলতা এবং তাঁর নানা ব্যক্তিগত উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে দুরপনেয় স্ববিরোধ।

'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্র-আলোচকদের বিরুদ্ধে তুলেছেন একটি মারাত্মক অভিযোগ; বলেছেন, ভক্তি ও আবেগ-প্রাবল্য প্রকৃত রবীন্দ্র-বিচারকে উদ্বেগজনক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এবং এ-থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন 'স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে এবং বিষয়ী ও সমাজ-সদস্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে সব সময়ে অভিন্ন করে' না-দেখা।

দীর্ঘ লেখক জীবনে অসংখ্য বিতর্কের প্রাণপুরুষ আহমদ শরীফের সবচেয়ে বিতর্কিত[৪] এই রচনায় তিনি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'ভক্ত'-ভাষ্যকারদের বিপরীত অবস্থান নিতে গিয়েই যেন, আড় চোখে সন্ধানী ছিদ্রান্বেষীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের দিকে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলি সম্পর্কে জনাব শরীফের অভিযোগগুলো সূত্রাকারে নিম্নরূপ :

ক. রবীন্দ্রসৃষ্টি সম্পূর্ণতই ইউরোপি চেতনার ফসল; অথচ প্রাচীন ভারত-চিন্তা থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটে নি। এই অসমন্বয়ই রবীন্দ্রচিন্তার ও রবীন্দ্রমনীষার অনেক অসংগতির কারণ।

খ. জমিদার হিসেবে রবীন্দ্র-পরিবার এবং বিশেষত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রজাপ্রীতি ও ঔদার্যের কোনো স্বাক্ষর রাখেন নি।

গ. তাঁর ইংরেজ-প্রীতি ছিল যৌক্তিক মাত্রার চেয়ে বেশি এবং স্বদেশের স্বাধীনতার কোনো স্বপ্ন তিনি দেখতে কিংবা দেখাতে পারেন নি।

ঘ. প্রতিবেশী এবং দীর্ঘকাল ভারত-শাসনকারী মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে রহস্যময় নীরবতা তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঔদার্যের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ঙ. জন স্টুয়ার্ট মিল কিংবা কার্ল মার্কস-এর মত চিন্তাবিদদের অনেক পরবর্তীকালের মানুষ হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের চিন্তাচেতনাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি বললেই চলে। কার্যত "আমৃত্যু তাঁর মানসের মৌল পরিবর্তন হয় নি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই"।

চ. রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণী-অবস্থানের বাইরে এসে সাধারণ নিম্নবিত্ত ও বিপন্ন মানুষের চিন্তানায়ক হয়ে উঠতে পারেন নি।

অবশ্য নাতিদীর্ঘ ঠাসবুননের ও দ্রুত-কথকতার প্রবন্ধটিতে বার কয়েক তিনি স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের রচনাব্যাপ্তি, উৎকর্ষ এবং অসামান্যতার কথা; আর অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই বলেছেন, আসক্ত রবীন্দ্র-বিচারের যে-বেড়াজাল রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মূর্তিকে বিকৃত করছে, তাকে আঘাত করাই যেন তাঁর বর্তমান অনুসন্ধানের লক্ষ্য।

দেখা যাচ্ছে, এ-পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেও, সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিচার নানা বৈপরীত্য এবং দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি নিরাসক্ত থাকেন নি। 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে যেখানে তিনি বিচার করেছেন মতবাদপুষ্টদের মতামত, সেখানে এক্ষেত্রে নিজেই হয়ে উঠেছেন মতবাদী। এবং মতবাদীর যে-সমস্যা, নিরাবেগ থাকতে না পারা, সংগত কারণেই আক্রান্ত হয়েছেন তাতে; আর দেখতে পেয়েছেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের আশু উপযোগ-চ্যুতি। 'রবীন্দ্র সাহিত্য ও গণমানব' প্রবন্ধে তিনি আহবান জানিয়েছেন, আবেগ ভক্তি কিংবা শ্রদ্ধার বাহুল্য ত্যাগ করে

রবীন্দ্রনাথকে বিচার করার। কিন্তু নিজেই আবার রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন মার্কসবাদীদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। ফলে ব্যক্তি ও কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তৈরি হয়েছে একটি অনভিপ্রেত বিরোধ।

লক্ষণীয়, 'দুই কবি : রবীন্দ্র-নজরুল' প্রবন্ধে কিংবা আরো অনেক রচনায় আহমদ শরীফ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ তুলেছেন, তার ভঙ্গিটি কিন্তু পুরোপুরি অনুযোগের। নজরুল সাম্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদী নন— এ-ব্যাপারে তিনি অভিযোগ তোলেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত মহত্তম প্রতিভা গণমানবের বিপ্লবকে স্বীকৃতি ও সহযোগিতা না-দিয়ে পারল কীভাবে— এ-ধরনের একটি অনুযোগ তাঁর অনেক রচনায় অপরোক্ষ হয়েছে।

৩.

আহমদ শরীফের রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো পাঠ করলে দেখা যাবে, সাহিত্য সমালোচনা বা সাহিত্যবিচার বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, তা তিনি সামান্যই করেছেন। 'অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ', 'বলাকা কাব্যে মৃত্যু-মহিমা', 'রবীন্দ্র-নাটক বিসর্জন : ভিন্ন দৃষ্টিতে অভ্যন্তরীণ স্বরূপ' প্রভৃতি যে-সব প্রবন্ধে তিনি কবিতা বা গ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেখানেও কোনো বিচারপদ্ধতি অনুসরণের নিষ্ঠা কিংবা নিজস্ব পদ্ধতি তৈরির উচ্চাভিলাষ দুর্লক্ষ্য। অবশ্য অধুনাতন কোনো কোনো রচনাধারা (discourse)-য় ব্যক্তিকে text হিসেবে বিচারের যে-সব শলাপরামর্শ দেওয়া হয়, তার নিরিখে আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিচারের কিছু অংশ মূল্যবান পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু পদ্ধতি (Methodology)-সম্মিতির অভাব প্রকট বলে এ-বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো দুরূহ।

বস্তুত রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনাগুচ্ছ অবলম্বনে যদি অন্বেষণ করি আহমদ শরীফের সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি, তাহলে একটি একরৈখিক বা অনেকান্তিক বিচার-পদ্ধতির পরিবর্তে আমরা পাবো বিচারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর সাহিত্যিক-সমালোচকী অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রেও অনেকটা অপরিবর্তিতই থাকবে।

তাঁর সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রচনার অবস্থান সমান্তরাল। অর্থাৎ, তাঁর কাছে ব্যক্তিসত্তা এবং লেখকসত্তা কিংবা ব্যক্তিমানস এবং লেখকমানস অভিন্ন বস্তু। লেখক ও রচনা (text)-র মধ্যে যে-দূরত্বটি বিশ শতকের গোড়া থেকে আবিষ্কৃত হতে হতে পোস্টমডার্ন বিভিন্ন সাহিত্যতত্ত্বে আজ দুরপনেয় হয়ে উঠেছে, তাঁর রচনাবলিতে সে-বিভেদের ছাপ পড়ে নি। যেমন ধরা যাক, 'নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদন' প্রবন্ধে[৫] মধুসূদনের অন্তর্লোকে প্রবেশের ব্যাপারটি। এখানে তিনি মধুসূদনের বহিরারোপিত জীবনদৃপ্তি ও ভোগলিপ্সার আত্যন্তিক বাড়াবাড়িকে ঐ-মহান কবির যুগপৎ জীবন ও সাহিত্যকর্মের মূলসূত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন : "মধুচরিত্রের মাধুর্য এখানেই, মধুজীবনের ট্রাজেডির বীজও এতেই উপ্ত আর মধু-সাহিত্যের তত্ত্বও এতে নিহিত" (রচনাবলি, ২০০০:১৬৯)। 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও

রবীন্দ্রমনীষা', 'রবীন্দ্র মানসের স্বরূপ সন্ধানে' প্রভৃতি প্রবন্ধে আহমদ শরীফ ব্যক্তি ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে একাকার করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। তৃতীয় পর্বে, যখন তাঁর রচনায় ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত নেতিবাচক ধারণার নানা চিহ্ন, তখনও এ-প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন হয় নি; অন্য বৈশিষ্ট্য মাথাচাড়া দিয়েছে মাত্র।

আহমদ শরীফের সাহিত্য বিচারে কবির কাব্য এবং বক্তব্য সমান্তরাল। 'রবীন্দ্রনাথ', 'অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রবন্ধে দেখি রবীন্দ্রনাথের কবিতার পঙ্‌ক্তি আর বাণীকে তিনি সমার্থক করে নিয়েছেন, ঠিক সেভাবে, যেভাবে বিবেচনা করা হয় প্রবন্ধের কোনো বাক্য বা অনুচ্ছেদকে। অর্থাৎ কবিতার 'অপরিচিতকরণ'-শক্তি এবং এর ফলে নৈর্ব্যক্তিক সত্য প্রকাশিত হবার সম্ভাবনাকে তিনি সামান্যই মান্য করেছেন। এ-অর্থেও, ব্যক্তি-মানস ও কবি-মানস, তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে, পুরোপুরি দ্বন্দ্বহীন।

কবিতায় তিনি অন্বেষণ করেছেন দর্শন। দার্শনিক প্রত্যয় খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই 'কবি বিহারীলাল' প্রবন্ধে[৬] বিহারীলালের কবিত্ব সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে; বিপরীতে, ঐ-বস্তুটির অভাব আছে— এমন ধারণা তাঁর বিপুল পরিমাণ নজরুল-বিষয়ক রচনাকে সংশয়ের প্রত্যক্ষ কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কবির কাছে তাঁর প্রধান চাওয়াটি হল জীবনবোধের পরিস্রুত উপস্থাপন। সে উপস্থাপনায় শৈলীর যদি অতি-সারল্য থাকে, কাব্যকলায় যদি খানিকটা টান পড়ে— তাতে তিনি মোটেই মনঃক্ষুণ্ন হন না। 'অতীন্দ্রিয় লোকে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে কবিতার শৈলীর প্রসঙ্গটি সংক্ষিপ্ততম আয়তনে তাঁর বিবেচনায় এসেছে। তিনি লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্বে 'কবিত্বের চেয়ে কথকতার প্রাধান্য'। কিন্তু এই শনাক্তি তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে নি, অনুযোগ-প্রবণও করে নি; বরং তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন এতে 'মননের ঔজ্জ্বল্য' প্রকাশিত দেখে।

আহমদ শরীফের সাহিত্য-আলোচনা 'সমগ্রবাদী, অতি বিশ্লেষণবাদী নয়'।[৭] টেক্সট্‌গুলোকে পৃথক মর্যাদা ও মাত্রায় বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে তিনি চেয়েছেন একটি সামগ্রিক সূত্রের রজ্জুতে সমগ্র রচনাকে একত্রে বাঁধতে। কোনো-একটি ধারণা বা আদর্শকে মানদণ্ড ধরে কবি বা স্রষ্টাকে বিচার করা আহমদ শরীফের সাহিত্য-বিচারের মৌল প্রবণতা। শুধু সৃষ্টি নয়, স্রষ্টাকেও তিনি একীভূত করে নেন ঐ-আদর্শ বা ধারণার সঙ্গে। প্রক্রিয়াটি সুবিধাজনক; কারণ, এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সূত্রবদ্ধ করা যায় কোনো মহান স্রষ্টার সৃষ্টি ও ব্যক্তিসত্তাকে, যেমন ঘটেছে তাঁর 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' প্রবন্ধে। কিন্তু এই ভঙ্গিটির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই লুকিয়ে থাকে এক চরমপন্থা— অন্য অনেক কিছুকে বাদ দিয়ে এতে গুরুতর করে তোলা হয় একটি অনুষঙ্গকে, কিংবা অন্যান্য সূত্রকে বিকৃত বা দমিত করে সাবয়ব হয়ে ওঠে একটি ধারণা। ফলে, 'রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে একটি স্মৃতিচারণ' প্রভৃতি প্রবন্ধে যেমন ঘটেছে, সিদ্ধান্তটি হয়ে ওঠে একমাত্রিক ও খণ্ডিত।

আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিবেচনার একটি বড় অংশ প্রতিক্রিয়াজাত। স্বভাবতই রচনার আভ্যন্তর সংগঠন ও বিবেচনা-কাঠামোয় এর প্রভাব পড়েছে। তাঁর রবীন্দ্রকেন্দ্রী রচনায়–যে মন্তব্যপ্রবণতা ও বুদ্ধিজীবীসুলভতার প্রতাপ, তারও মূলে আছে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ভঙ্গি। এসব কারণে *রবীন্দ্র-ভাবনা* গ্রন্থের একট বড় অংশ সমকালকে যতটা সন্তুষ্ট করেছে, ভাবীকালের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি।

৪.

আহমদ শরীফের সাহিত্য-চিন্তার প্রধান অনুষঙ্গ দেশ, কাল ও জাতি।[৮] সাহিত্যকে তিনি স্বয়ম্ভূ বা বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি বলে মনে করেন না; বরং তাকে পরিপ্রেক্ষিতের একটি গভীর যোগসূত্রের ফল হিসেবেই বিচার করেন। 'বাঙলা সাহিত্যের উপক্রমণিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে[৯] তিনি বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি নৃতত্ত্বের, আর জাতি হিসেবে বাঙালির উদ্ভব ও বিকাশের জটিল ভাঁজসমূহকেই চিহ্নিত করেছেন সংশ্লিষ্ট পর্বের সাহিত্য সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে। কম-বেশি এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর রবীন্দ্র-ভাবনায়ও সক্রিয় ছিল। 'রবীন্দ্র মানসের স্বরূপ সন্ধানে' প্রবন্ধে উনিশ শতকী বাঙালি নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে ইউরোপি শিক্ষার ফসল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এমন-কি 'মতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' কিংবা 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধের বিবেচনাও রবীন্দ্রনাথের জন্ম-পরিপ্রেক্ষিত এবং শ্রেণী অবস্থানকে মান্যতা দিয়েই সাবয়ব হয়েছে।

দেশ-কাল-জাতি যেমন সাহিত্য সৃষ্টির সামগ্রিক জলহাওয়া তৈরি করে, ঠিক তেমনি সৃষ্ট সাহিত্য কিংবা মহৎ সাহিত্যিক প্রভাবিত করে থাকে জাতিকে। যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর একটি সিদ্ধান্ত এরূপ : "আজকের সংস্কৃতিবান মানবতাবাদী বাঙালি মাত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান" (আহমদ শরীফ, ২০০১:১৭)। এসব কারণেই তাঁর কাছে সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি "সৃষ্টির অন্তরালে ও নিম্নে কী রয়েছে তা দেখতে চান। সেখানে তিনি ইতিহাসকে দেখতে পান।"[১০] ঐতিহাসিক ধারাক্রমকে গুরুত্ব দেন বলেই হয়ত একজন সাহিত্যিকের সামগ্রিক রচনাকে একটি কেন্দ্রীয় সুতোয় বাঁধতে তাঁর আগ্রহ, আর সম্ভবত একই কারণে সাহিত্যের চেয়ে সাহিত্যিকের প্রতিই তাঁর আকর্ষণটি প্রগাঢ়। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস যতটা সাহিত্যের ইতিহাস, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় ইতিহাস।

কলাকৈবল্যবাদে আহমদ শরীফের কোনো আগ্রহ ছিল না। সাহিত্য, সে সৌন্দর্য-উৎপাদীই হোক আর জাগরণমূলকই হোক, তাঁর কাছে শ্রেয়োবোধ জাগানোর মাধ্যম। এক্ষেত্রে তাঁর "একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেটা হচ্ছে হিতবাদ, যার অপর নাম উপযোগবাদ"।[১১] তাঁর কোনো কাজ যেমন উদ্দেশ্যহীন ছিল না, কোনো লেখাও তেমনি ছিল না কল্যাণচিন্তাহীন। একই সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্যের ক্ষেত্রেও উপযোগই বিচার করেছেন তিনি। নজরুলের সাহিত্য-সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা ছিল

প্রবল। কিন্তু, তবুও নজরুল-যে তাঁর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমৃত্যু, তার কারণ নজরুল-সাহিত্যের ব্যাপক-গভীর উপযোগ। রবীন্দ্র-বিচারের প্রথম পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথকে একজন শিল্পী হিসেবে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন তিনি, তখনও তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ মহত্তম প্রতিভা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এ-কারণে যে, "তাঁর স্বভাষী তাঁর কাছে পেয়েছে সৌন্দর্য দেখার চোখ, সুরুচির পাঠ, মানবতার বোধ ও বিশ্বজনীনতার দীক্ষা" (আহমদ শরীফ, ২০০১:১৭)। মধ্যপর্বে তাঁর রবীন্দ্রভাবনা পুরোপুরি সমকালীন জাতীয় প্রেক্ষাপটের উপযোগিতারই সারাৎসার। আর উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তিনি–যে পৌঁছেছিলেন খানিকটা উন্নাসিক সিদ্ধান্তসমূহে, তারও কারণ, উপযোগ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নতুন আয়তন— তাঁর উপযোগবাদ এ-সময় রূপ নিয়েছিল শ্রেণী-উপযোগে।

আহমদ শরীফের সাহিত্য-'চিন্তা শ্রেণী মঙ্গল প্রত্যাশী।'[১২] অন্তত জীবনের শেষ তিন দশকের সাহিত্যচিন্তায় 'গণমানব'-এর কল্যাণচিন্তা তাঁর রবীন্দ্র-ভাবনাসহ সকল সাহিত্য বিবেচনার উপর কর্তৃত্ব করেছে। "বস্তুত গণমানুষের স্বার্থকেই তিনি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রে দেখতে চান।"[১৩] এ-দৃষ্টিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়েছেন স্বাধীনতা-উত্তরকালে, আর আবিষ্কার করেছেন অসামান্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনীষা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-কাজের সীমাবদ্ধতা। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেণী অবস্থানই তাঁর কাজের ঐ-গণ্ডি তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু, কারণ যাই হোক, "শ্রেণীস্বার্থের অচেতন কিংবা সচেতন বাধাই সাহিত্যে রবীন্দ্র ভূমিকা সীমিত রেখেছিল" (আহমদ শরীফ, ২০০১:৭৫)। অন্যত্র তিনি লক্ষ করেছেন, "সমাজ পরিবর্তন যাদের লক্ষ্য, যারা গণমানবের আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ", রবীন্দ্রনাথ তাদের সাহায্য করছেন না।

'গণমানব'-এর পক্ষের সাহিত্যকে আহমদ শরীফ যেভাবে দেখতে চেয়েছেন, তা মার্কসবাদী শ্রেণীসংগ্রামীদের অনুরূপ। তবে মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বে তাঁর আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। অনেকটা দলীয় সিদ্ধান্তের মত তিনি সাহিত্যকে ভাগ করেছেন দুভাগে— রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক তাৎপর্য আছে এমন সাহিত্য, আর ব্যক্তিগত বা সৌন্দর্য-উৎপাদী সাহিত্য। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীটির প্রতি নিজের পক্ষপাত তিনি লুকাতে চান নি; আর এই পক্ষপাতেরই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় সুকান্তকে প্রেরণার উৎস হিসেবে অগ্রাধিকার দেওয়া তাঁর সেই বহু-বিতর্কিত মন্তব্যে।

৫.

সব মিলিয়ে রবীন্দ্র-বিচারে আহমদ শরীফ বিশ্লেষণপ্রবণ যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি মন্তব্যপ্রবণ। তাই সেই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া সামলাতে কিংবা মন্তব্যের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে তাঁর উত্তর-কালের রবীন্দ্র-বিবেচনার একটি বড় অংশ, বলা যায়, অপচিত হয়েছে। তা-সত্ত্বেও *রবীন্দ্র-ভাবনা* গ্রন্থটি অন্তত দুটি কারণে মূল্যবান। প্রথমত, নানা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতি ও নির্ভরযোগ্যতা ইতোমধ্যেই পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হয়েছে। এমতাবস্থায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি কী ভেবেছেন, তার খোঁজ নেওয়া

জরুরি। দ্বিতীয়ত, তাঁর রবীন্দ্র-মূল্যায়নে আছে এমন-সব মন্তব্য ও শনাক্তি, যা পরিচিত এবং পুরনো রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় চেখে দেখার আমন্ত্রণ জানায়। অতিরিক্ত প্রাপ্তি হিসেবে তা, কদাচ, পাঠকের মননদেশে সেঁটে দেয় দেখার নতুন চোখ।

তথ্যনির্দেশ

১. মৃত্যুর পর প্রকাশিত দুটি সুপরিসর স্মারকগ্রন্থে অধ্যাপক আহমদ শরীফ অভিষিক্ত হয়েছেন এমন-সব বিশেষণ ও বিশেষণপ্রতিম বাক্যমালায়, যা যে-কোনো ক্ষেত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য শ্লাঘার বিষয়। অনুমান করা যায়, এসব সম্ভাষণে সময়ের নৈকট্যজনিত আবেগ ক্রিয়াশীল ছিল; কিন্তু, নানা মত-পথের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিত্বের একত্র-অভিবাদন আমাদের কৌতূহল, শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন না-করে যায় না।

২. আহমদ শরীফের রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনার সংকলন *রবীন্দ্র-ভাবনা* প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এ-গ্রন্থের মুখবন্ধ 'প্রসঙ্গ-কথা'-য় ড. নেহাল করিম জানিয়েছেন— "সঙ্কলিত শেষ রচনাটি যা 'বুদ্বুদ' শিরোনামে আছে তা তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ তারিখে লিখেছিলেন এবং সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ লেখা"।

৩. এ-আলোচনায় বিবেচনায় আনা হয়েছে আহমদ শরীফের মৃত্যু-উত্তর প্রকাশিত *রবীন্দ্র-ভাবনা* (সময় প্রকাশন, ঢাকা) গ্রন্থভুক্ত ষোলটি প্রবন্ধ ও একটি সাক্ষাৎকারকে।

৪. 'রবীন্দ্রোত্তর তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র মূল্যায়ন' প্রবন্ধটি দুই বাংলায় তুমুলভাবে সমালোচিত হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক গ্রন্থ বা দীর্ঘ প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য : 'মনুষ্যত্বের উন্মেষবিকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিকল্প নেই' শীর্ষক সাক্ষাৎকারের টীকা-ভাষ্য অংশ। ড. প্রথমা রায়মণ্ডল কর্তৃক সংগৃহীত সাক্ষাৎকারটি *রবীন্দ্র-ভাবনা* গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৫. প্রবন্ধটি তাঁর *বিচিত চিন্তা* গ্রন্থভুক্ত; পরে রচনাবলি ১ম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

৬. *কালিক ভাবনা* গ্রন্থভুক্ত এই প্রবন্ধ পরে লেখকের *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (১৯৯৯) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

৭. আফজালুল বাসার, 'অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর চিন্তার বিষয়ব্যাপ্তি' শীর্ষক প্রবন্ধ। *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ২০০১-এ সংকলিত, পৃ. ১৯৪

৮. আফজালুল বাসার, প্রাগুক্ত।

৯. প্রবন্ধটি *জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত; পরে সংকলিত হয়েছে রচনাবলি ১ম খণ্ড এবং *নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থে।

১০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'আহমদ শরীফের স্বতঃস্ফূর্ত উপচিকীর্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ*, ২০০১-এ সংকলিত, পৃ. ১৫০

১১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত।

১২ আফজালুল বাসার, প্রাগুক্ত।

১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহমদ শরীফ, ১৯৯৯ *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

২. আহমদ শরীফ, ২০০০ *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড (আহমদ কবির ও আবুল হাসনাত সম্পা.), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. আহমদ শরীফ, ২০০১ *রবীন্দ্র-ভাবনা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

৪. আফজালুল বাসার সম্পাদিত, ২০০১ *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলী*, অনন্যা, ঢাকা।

৫. মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার সম্পাদিত, ২০০১ *আহমদ শরীফ স্মারকগ্রন্থ*, ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।